আল আহক্বাফ

৪৬

নামকরণ

২১ নম্বর আয়াতের إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ বাক্যাংশ থেকে নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরা নাযিল হওয়ার সময়–কাল ২৯ থেকে ৩২ আয়াতে বর্ণিত একটি ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে নিরূপিত হয়ে যায়। ঐ আয়াতগুলোতে রসূলুল্লাহর (সা) কাছে এসে জিনদের ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে যাওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হাদীস ও সীরাত গ্রন্থসমূহের ঐকমত্যের ভিত্তিতে বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ অনুসারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সময় তায়েফ থেকে মক্কায় ফিরে আসার পথে নাখলা নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করেছিলেন সেই সময় ঘটনাটি ঘটেছিলো। সমস্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুসারে হিজরতের তিন বছর পূর্বে নবী (সা) তায়েফ গমন করেছিলেন। সুতরাং এ সূরা যে নবুওয়াতের ১০ম বছরের শেষ দিকে অথবা ১১শ বছরের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছিলো তা নিরূপিত হয়ে যায়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

নবীর (সা) পবিত্র জীবনে নবুওয়াতের ১০ম বছর ছিল অত্যন্ত কঠিন বছর। তিন বছর ধরে কুরাইশদের সবগুলো গোত্র মিলে বনী হাশেম এবং মুসলমানদের পুরোপুরি বয়কট করে রেখেছিলো। নবী (সা) তাঁর খান্দানের লোকজন ও মুসলমানদের সাথে শে'বে আবি তালিব* মহল্লায় অবরুদ্ধ হয়ে ছিলেন। কুরাইশদের লোকজন এই মহল্লাটিকে সব দিক থেকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলো। এ অবরোধ ডিঙিয়ে কোন প্রকার রসদ ভেতরে যেতে পারতো না। শুধু হজ্জের মওসুমে এই অবরুদ্ধ লোকগুলো বের হয়ে কিছু কেনাকাটা করতে পারতো। কিন্তু আবু লাহাব যখনই তাদের মধ্যে কাউকে বাজারের দিকে বা কোন বাণিজ্য কাফেলার দিকে যেতে দেখতো চিৎকার করে বণিকদের বলতো, 'এরা যে জিনিস

* শে'বে আবি তালিব মক্কার একটি মহল্লার নাম। এখানে বনী হাশেম গোত্রের লোকজন বাস করতেন। আরবী ভাষায় شعب শব্দের অর্থ উপত্যকা বা পাহাড়ের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র বাসযোগ্য ভূমি। মহল্লাটি যেহেতু 'আবু কুবাইস' পাহাড়ের একটি উপত্যকায় অবস্থিত ছিল এবং আবু তালিব ছিলেন বনী হাশেমদের নেতা। তাই এটিকে শে'বে আবি তালিব বলা হতো। পবিত্র মক্কার যে স্থানটি বর্তমানে স্থানীয় বর্ণনা অনুসারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম স্থান হিসেবে পরিচিত তার সন্নিকটেই এই উপত্যকা অবস্থিত ছিল। বর্তমানে একে শে'বে আলী বা শে'বে বনী হাশেম বলা হয়ে থাকে।

কিনতে চাইবে তার মূল্য এত অধিক চাইবে যেন এরা তা খরিদ করতে না পারে। আমি ঐ জিনিস তোমাদের নিকট থেকে কিনে নেব এবং তোমাদের লোকসান হতে দেব না। একাধারে তিন বছরের এই বয়কট মুসলমান ও বনী হাশেমদের কোমর ভেঙে দিয়েছিলো। তাদেরকে এমন সব কঠিন সময় পাড়ি দিতে হয়েছিলো যখন কোন কোন সময় ঘাস এবং গাছের পাতা খাওয়ার মত পরিস্থিতি এসে যেতো।

অনেক কষ্টের পর এ বছরই সবেমাত্র এই অবরোধ ভেঙ্গেছিলো। নবী (সা) চাচা আবু তালিব, যিনি দশ বছর ধরে তাঁর জন্য ঢাল স্বরূপ ছিলেন ঠিক এই সময় ইন্তেকাল করেন। এই দুর্ঘটনার পর এক মাস যেতে না যেতেই তাঁর জীবন সঙ্গিনী হযরত খাদীজাও ইন্তেকাল করেন যিনি নবুওয়াত জীবনের শুরু থেকে ঐ সময় পর্যন্ত নবীর (সা) জন্য প্রশান্তি ও সান্তনার কারণ হয়ে ছিলেন। একের পর এক এসব দুঃখ কষ্ট আসার কারণে নবী (সা) এ বছরটিকে (عام الحزن) "আমুল হুযন্" বা দুঃখ বেদনার বছর বলে উল্লেখ করতেন।

হযরত খাদীজা ও আবু তালিবের মৃত্যুর পর মক্কার কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে আরো অধিক সাহসী হয়ে উঠলো এবং তাঁকে আগের চেয়ে বেশী উত্যক্ত করতে শুরু করলো। এমন কি তাঁর জন্য বাড়ীর বাইরে বের হওয়াও কঠিন হয়ে উঠলো। ইবনে হিশাম সেই সময়ের একটি ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন কুরাইশদের এক বখাটে লোক জনসমক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথায় ধূলা নিক্ষেপ করে।

অবশেষে তিনি তায়েফে গমন করলেন। উদ্দেশ্য সেখানে বনী সাকীফ গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেবেন। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে অন্তত এ মর্মে তাদের সম্মত করাবেন যেন তাঁকে তাদের কাছে শান্তিতে থেকে তারা ইসলামের কাজ করার সুযোগ দেবে। সেই সময় তাঁর কাছে কোন সওয়ারীর জন্তু পর্যন্ত ছিল না। মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত গোটা পথ তিনি পায়ে হেঁটে অতিক্রম করলেন। কোন কোন বর্ণনা অনুসারে তিনি একাই তায়েফ গিয়েছিলেন এবং কোন কোন বর্ণনা অনুসারে শুধু যায়েদ ইবনে হারেসা তাঁর সাথে ছিলেন। সেখানে পৌঁছার পর তিনি কয়েক দিন সেখানে অবস্থান করলেন এবং সাকীফের নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে আলাপ করলেন। কিন্তু তারা তাঁর কোন কথা যে মানলো না শুধু তাই নয়, বরং স্পষ্ট ভাষায় তাদের শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার হুকুম শুনিয়ে দিল। কেননা তারা শংকিত হয়ে পড়েছিলো তাঁর প্রচার তাদের যুবক শ্রেণীকে বিগড়ে না দেয়। সুতরাং বাধ্য হয়েই তাঁকে তায়েফ ত্যাগ করতে হলো। তিনি তায়েফ ত্যাগ করার সময় সাকীফ গোত্রের নেতারা তাদের বখাটে ও পাণ্ডাদের তাঁর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল। তারা পথের দুই পাশ দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত তাঁর প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ, গালিবর্ষণ এবং পাথর ছুঁড়ে মারতে মারতে অগ্রসর হতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত তিনি আহত হয়ে অবসন্ন হয়ে পড়লেন এবং তাঁর জুতা রক্তে ভরে গেলো। এ অবস্থায় তিনি তায়েফের বাইরে একটি বাগানের প্রাচীরের ছায়ায় বসে পড়লেন এবং আল্লাহর কাছে এই বলে ফরিয়াদ করলেন ঃ

হে আল্লাহ! আমি শুধু তোমার কাছে আমার অসহায়ত্ব ও অক্ষমতা এবং মানুষের দৃষ্টিতে নিজের অমর্যাদা ও মূল্যহীনতার অভিযোগ করছি। হে সর্বাধিক দয়ালু ও করুণাময়!

তুমি সকল দুর্বলদের রব। আমার রবও তুমিই। তুমি আমাকে কার হাতে ছেড়ে দিচ্ছ? এমন কোন অপরিচিতের হাতে কি যে আমার সাথে কঠোর আচরণ করবে? কিংবা এমন কোন দুশমনের হাতে কি যে আমার বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করবে? তুমি যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হও তাহলে আমি কোন বিপদের পরোয়া করি না। তবে তোমার নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভ করলে সেটা হবে আমার জন্য অনেক বেশী প্রশস্ততা। আমি আশ্রয় চাই তোমার সত্তার সেই নূরের যা অন্ধকারকে আলোকিত এবং দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপারসমূহকে পরিশুদ্ধ করে। তোমার গযব যেন আমার ওপর নাযিল না হয় তা থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করো এবং আমি যেন তোমার ক্রোধ ও তিরস্কারের যোগ্য না হই। তোমার মর্জিতেই আমি সন্তুষ্ট যেন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। তুমি ছাড়া আর কোন জোর বা শক্তি নেই।" (ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬২)

ভগ্ন হৃদয় ও দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে ফিরে যাওয়ার পথে যখন তিনি "কারনুল মানাযিল" নামক স্থানের নিকটবর্তী হলেন তখন মাথার ওপর মেঘের ছায়ার মত অনুভব করলেন। দৃষ্টি তুলে চেয়ে দেখলেন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম সামনেই হাজির। জিবরাঈল ডেকে বললেন ঃ "আপনার কওম আপনাকে যে জবাব দিয়েছে আল্লাহ তা শুনেছেন। এই তো আল্লাহ পাহাড়ের ব্যবস্থাপক ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন। আপনি যা ইচ্ছা তাকে নির্দেশ দিতে পারেন।" এরপর পাহাড়ের ব্যবস্থাপক ফেরেশতা তাঁকে সালাম দিয়ে আরজ করলেন ঃ আপনি যদি আদেশ দেন তাহলে দুই দিকের পাহাড় এই সব লোকদের ওপর চাপিয়ে দেই।" তিনি বললেন ঃ না, আমি আশা করি আল্লাহ তাদের বংশে এমন সব লোক সৃষ্টি করবেন যারা এক ও লা–শরীক আল্লাহর দাসত্ব করবে।" (বুখারী, বাদউল খালক, যিকরুল মালাইকা, মুসলিম, কিতাবুল মাগাযী, নাসায়ী, আলবু'য়স)।

এরপর তিনি নাখলা নামক স্থানে গিয়ে কয়েক দিনের জন্য অবস্থান করলেন। এখন কিভাবে মক্কায় ফিরে যাবেন সে কথা ভাবছিলেন।

তায়েফে যা কিছু ঘটেছে সে খবর হয়তো সেখানে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে। এখন তো কাফেররা আগের চেয়েও দুঃসাহসী হয়ে উঠবে। এই সময়ে একদিন রাতের বেলা যখন তিনি নামাযে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করছিলেন সেই সময় জিনদের একটি দল সেখানে এসে হাজির হলো। তারা কুরআন শুনলো, তার প্রতি ঈমান আনলো এবং ফিরে গিয়ে নিজ জাতির মধ্যে ইসলামের প্রচার শুরু করলো। আল্লাহ তাঁর নবীকে এই সুসংবাদ দান করলেন যে, আপনার দাওয়াত শুনে মানুষ যদিও দূরে সরে যাচ্ছে, কিন্তু বহু জিন তার ভক্ত অনুরক্ত হয়ে পড়েছে এবং তারা একে স্বজাতির মধ্যে প্রচার করছে।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এই পরিস্থিতিতে সূরাটি নাযিল হয়। যে ব্যক্তি একদিকে নাযিল হওয়ার এই পরিস্থিতি সামনে রাখবে এবং অন্য দিকে গভীর মনোনিবেশ সহকারে সূরাটি পড়বে তার মনে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকবে না যে এটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী নয়। বরং "এটি মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।" কেননা, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা সূরার মধ্যে কোথাও সেই ধরনের মানবিক আবেগ ও প্রতিক্রিয়ার সামান্য লেশ মাত্র নেই যা সাধারণত এরূপ পরিস্থিতির শিকার মানুষের

মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হয়। এটা যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী হতো যাকে একের পর এক বড় বড় দুঃখ–বেদনা ও মুসিবত এবং তায়েফের সাম্প্রতিক আঘাত দুর্দশার চরমে পৌছিয়ে দিয়েছিলো—তাহলে এই পরিস্থিতির কারণে তাঁর মনের যে অবস্থা ছিল সূরার মধ্যে কোথাও না কোথাও তার চিত্র দৃষ্টিগোচর হতো। উপরে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে দোয়া উদ্ধৃত করেছি তার প্রতি একটু লক্ষ্য করুন। সেটা তাঁর নিজের বাণী। ঐ বাণীর প্রতিটি শব্দ সেই পরিস্থিতিরই চিত্রায়ন। কিন্তু এই সূরাটি সেই একই সময়ে একই পরিস্থিতিতে তাঁরই মুখ থেকে বেরিয়েছে, অথচ সেই পরিস্থিতি জনিত প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

কাফেররা বহুবিধ গোমরাহীর মধ্যে শুধু ডুবেই ছিল না বরং প্রচণ্ড জিদ, গর্ব ও অহংকারের সাথে তা আঁকড়ে ধরে ছিল। আর যে ব্যক্তি এসব গোমরাহী থেকে তাদেরকে উদ্ধার করতে সচেষ্ট ছিল তাকে তারা তিরস্কার ও সমালোচনার লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছিলো। এই সব গোমরাহীর ফলাফল সম্পর্কে কাফেরদের সাবধান করাই সূরার মূল আলোচ্য বিষয়। তাদের কাছে দুনিয়াটা ছিল একটা উদ্দেশ্যহীন খেলার বস্তু। তারা এখানে নিজেদেরকে দায়িত্বহীন সৃষ্টি মনে করতো। তাদের মতে তাওহীদের দাওয়াত ছিল মিথ্যা। তাদের উপাস্য আল্লাহর অংশীদার, তাদের এ দাবীর ব্যাপারে তারা ছিল একগুঁয়ে ও আপোষহীন। কুরআন আল্লাহর বাণী একথা মানতে তারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। রিসালাত সম্পর্কে তাদের মন–মগজে ছিল একটি অদ্ভুত জাহেলী ধারণা এবং সেই ধারণার ভিত্তিতে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের দাবী পরখ করার জন্য নানা ধরনের অদ্ভুত মানদণ্ড পেশ করছিলো। তাদের মতে ইসলামের সত্য না হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ছিল এই যে, তাদের নেতৃবৃন্দ, বড় বড় গোত্রীয় সর্দার এবং তাদের কওমের গবুচন্দ্ররা তা মেনে নিচ্ছিলো না এবং শুধু কতিপয় যুবক, কিছু সংখ্যক দরিদ্র লোক এবং কতিপয় ক্রীতদাস তার ওপর ঈমান এনেছিলো। তারা কিয়ামত, মৃত্যুর পরের জীবন এবং শাস্তি ও পুরস্কারের বিষয়কে মনগড়া কাহিনী বলে মনে করতো। তাদের ধারণা ছিল, বাস্তবে এসব ঘটা একেবারেই অসম্ভব।

এ সূরায় এসব গোমরাহীর প্রত্যেকটিকে সংক্ষেপে যুক্তি–প্রমাণসহ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং কাফেরদের এই বলে সাবধান করা হয়েছে যে, তোমরা বিবেক–বুদ্ধি ও যুক্তি–প্রমাণের সাহায্যে সত্য ও বাস্তবতা বুঝার চেষ্টা করার পরিবর্তে যদি গোড়ামি ও হঠকারিতার মাধ্যমে কুরআনের দাওয়াত ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতকে প্রত্যাখ্যান করো তাহলে নিজেদের ভবিষ্যত নিজেরাই ধ্বংস করবে।

পরম করুণাময় ও মেহেরবান আল্লাহর নামে

حٰمٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ﴿٣﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۗ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤﴾

হা–মী–ম। এই কিতাব মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।[১] আমি যমীন ও আসমান এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে যথার্থ সত্যের ভিত্তিতে বিশেষ সময় নির্ধারিত করে সৃষ্টি করেছি।[২] কিন্তু যে বিষয়ে এই কাফেরদের সাবধান করা হয়েছে তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে আছে।[৩]

হে নবী, এদের বলে দাও, "তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ডেকে থাকো কখনো কি তাদের ব্যাপারে ভেবে দেখেছো? আমাকে একটু দেখাও তো পৃথিবীতে তারা কি সৃষ্টি করেছে কিংবা আসমানসমূহের সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনায় তাদের কি অংশ আছে। যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে ইতিপূর্বে প্রেরিত কোন কিতাব কিংবা জ্ঞানের কোন অবশিষ্টাংশ (এসব আকীদা–বিশ্বাসের সমর্থনে) তোমাদের কাছে থাকলে নিয়ে এসো।[৪]

১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরাতুয যুমার, টীকা ১ এবং সূরা আল জাসিয়া, টীকা ১, এর সাথে সূরা আস সিজদার এক নম্বর টীকাও যদি সামনে থাকে তাহলে এই ভূমিকার মূল ভাবধারা উপলব্ধি করা সহজ হবে।

২. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আন'আম, টীকা ৪৬; ইউনুস, টীকা ১১; ইবরাহীম, টীকা ৩৩; আল হিজর, টীকা ৪৭; আন নাহল, টীকা ৬; আল আম্বিয়া, টীকা ১৫ থেকে ১৭; আল মু'মিনুন, টীকা ১০২; আল আনকাবূত, টীকা ৭৫ ও ৭৬; লোকমান, টীকা ৫১; আদ দুখান, টীকা ৩৪ এবং আল জাসিয়া, টীকা ২৮।

৩. অর্থাৎ প্রকৃত সত্য হলো বিশ্ব জাহানের এই ব্যবস্থা উদ্দেশ্যহীন কোন খেলার বস্তু নয়, বরং একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ ব্যবস্থা যেখানে ভাল ও মন্দ এবং জালেম ও মজলুমের ফায়সালা অবশ্যই ইনসাফ মোতাবেক হতে হবে। আবার বিশ্ব জাহানের এই ব্যবস্থা স্থায়ীও নয়। এর জন্য একটা সময় নির্ধারিত আছে যা শেষ হওয়ার পর তাকে অবশ্যই ধ্বংস হতে হবে। তাছাড়া আল্লাহর আদালতের জন্যও একটা সময় নির্ধারিত আছে। সেই সময় আসলে তা অবশ্যই কায়েম হবে। কিন্তু যারা আল্লাহর রসূল ও তাঁর কিতাব মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তারা এসব সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে। তারা এ চিন্তা মোটেই করছে না যে, এমন এক সময় অবশ্যই আসবে যখন তাদেরকে নিজেদের কাজ-কর্মের জবাবদিহি করতে হবে। তারা মনে করে এসব পরম সত্য সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে আল্লাহর রসূল তাদের কোন ক্ষতি করেছেন। অথচ তিনি তাদের অনেক কল্যাণ করেছেন। কারণ, হিসাব, নিকাশ ও জবাবদিহির সময় আসার পূর্বেই তিনি তাদের শুধু বলেননি যে, সে সময় আসবে বরং যাতে তারা সে জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে সে জন্য কোন্ কোন্ বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে সাথে সাথে তাও বলে দিয়েছেন।

পরবর্তী বক্তব্য বুঝার জন্য এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ সম্পর্কে মানুষ তার আকীদা বা বিশ্বাস নির্ধারণে যে ভুল করে সেটিই তার সবচেয়ে বড় মৌলিক ভুল। এ ব্যাপারে ঢিলাঢালা ও উদাসীন ভাব দেখিয়ে কোন গভীর এবং গঠনমূলক চিন্তা ও বিশ্লেষণ ছাড়া ভাসা ভাসা, হালকা, অগভীর আকীদা গড়ে নেয়া এমন একটি বড় বোকামি যা পার্থিব জীবনে মানুষের চাল চলন ও আচার-আচরণকে এবং চিরদিনের জন্য তার পরিণামকে ধ্বংস করে ফেলে। কিন্তু যে কারণে মানুষ এই বিপজ্জনক গাছাড়া ভাব ও উদাসীনতার মধ্যে হারিয়ে যায় তা হলো, সে নিজেকে দায়িত্বহীন ও জবাবদিহি মুক্ত মনে করে এবং এই ভুল ধারণা পোষণ করে বসে যে, আমি আল্লাহ সম্পর্কে যে আকীদাই গ্রহণ করি না কেন তাতে কোন পার্থক্য সূচিত হয় না। কেননা, হয় মৃত্যুর পরে আদৌ কোন জীবন নেই যেখানে আমাকে কোন প্রকার জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে, কিংবা এমন কোন জীবন হবে যেখানে জবাবদিহি করতে হলেও আমি যেসব সত্তার আশ্রয় নিয়ে আছি তারা আমাকে খারাপ পরিণতি থেকে রক্ষা করবে। দায়িত্বানুভূতির এই অনুপস্থিতি ব্যক্তিকে ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুবিবেচনাহীন বানিয়ে দেয়। সে কারণে সে পরম নিশ্চিন্ততার সাথে নাস্তিকতা থেকে শুরু করে শিরকের চরম অযৌক্তিক পন্থা পর্যন্ত নানা ধরনের অর্থহীন আকীদা-বিশ্বাস নিজেই রচনা করে অথবা অন্যদের রচিত আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করে নেয়।

৪. যেহেতু শ্রোতারা একটি মুশরিক জাতির লোক তাই তাদের বলা হচ্ছে, দায়িত্বানুভূতির অনুপস্থিতির কারণে তারা না বুঝে শুনে কিভাবে এক চরম অযৌক্তিক আকীদা আঁকড়ে ধরে আছে। তারা আল্লাহকে বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা স্বীকার করার সাথে

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٦﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۖ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٨﴾

সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশী পথভ্রষ্ট কে যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব সত্তাকে ডাকে যারা কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম নয়।[৫] এমনকি আহবানকারী যে তাকে আহ্‌বান করছে সে বিষয়েও সে অজ্ঞ।[৬] যখন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে তখন তারা নিজেদের আহবানকারীর দুশমন হয়ে যাবে এবং ইবাদতকারীদের অস্বীকার করবে।[৭]

যখন এসব লোকদের আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ শুনানো হয় এবং সত্য তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করে তখন এই কাফেররা বলে এতো পরিষ্কার যাদু।[৮] তারা কি বলতে চায় যে, রসূল নিজেই এসব রচনা করেছেন?[৯] তাদের বলে দাও ঃ "আমি নিজেই যদি তা রচনা করে থাকি তাহলে কোন কিছু আমাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারবে না। যেসব কথা তোমরা তৈরী করছো আল্লাহ তা ভাল করেই জানেন। আমার ও তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য তিনিই যথেষ্ট।[১০] তিনি অতীব ক্ষমাশীল ও দয়ালু।[১১]

সাথে আরো বহু সত্তাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিলো। তাদের কাছে প্রার্থনা করতো, তাদেরকে নিজের প্রয়োজন পূরণকারী ও বিপদ ত্রাণকারী মনে করতো, তাদেরকে তোসামোদ করতো এবং নজর–নিয়াজ পেশ করতো এবং মনে করতো, আমাদের ভাগ্য গড়ার ও ভাঙার সমস্ত ক্ষমতা তাদেরই আছে। সেই সব ব্যক্তিদের সম্পর্কেই তাদের জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে, তোমরা কি কারণে তাদেরকে নিজেদের উপাস্যের মর্যাদা দান করেছো? একথা সবারই জানা যে, উপাস্য হওয়ার অধিকারে আল্লাহর সাথে কাউকে

অংশীদার করার দুটি ভিত্তি হতে পারে। সে ব্যক্তি নিজে কোন মাধ্যমের সাহায্যে জেনে নিয়েছে যে, যমীন ও আসমান সৃষ্টির ব্যাপারে সত্যিই তার কোন অংশ আছে, নয়তো আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন যে, খোদায়ীর কাজে অমুক ব্যক্তি আমার অংশীদার। এখন যদি কোন মুশরিক এ দাবী করতে না পারে যে তার উপাস্যদের আল্লাহর শরীক হওয়ার ব্যাপারে তার কাছে সরাসরি জ্ঞান আছে, অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত কোন কিতাবে দেখাতে না পারে যে আল্লাহ নিজেই কাউকে তাঁর শরীক ঘোষণা করেছেন, তাহলে তার এই আকীদা অবশ্যই চূড়ান্তরূপে ভিত্তিহীন।

এই আয়াতে "ইতিপূর্বে প্রেরিত কোন কিতাব" অর্থ এমন কোন কিতাব যা আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআন নাযিলের পূর্বে প্রেরিত হয়েছে। আর জ্ঞানের "অবশিষ্টাংশ" অর্থ প্রাচীনকালের নবী–রসূল ও নেক লোকদের শিক্ষার এমন কোন অংশ যা পরবর্তী বংশধরদের কাছে নির্ভরযোগ্য কোন সূত্রে পৌঁছেছে। এই দুটি সূত্রে মানুষ যা কিছুই লাভ করেছে তার মধ্যে শিরকের লেশমাত্র নেই। কুরআন যে তাওহীদের দিকে আহবান জানাচ্ছে সমস্ত আসমানী কিতাব সর্বসম্মতভাবে সেই তাওহীদই পেশ করছে। প্রাচীন জ্ঞান–বিজ্ঞানের যতটুকু স্মৃতিচিহ্ন অবশিষ্ট আছে তার মধ্যেও কোথাও এ প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, নবী, অলী বা নেক্‌কার ব্যক্তিগণ মানুষকে কখনো আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করার শিক্ষা দিয়েছেন। এমনকি কিতাব অর্থ যদি আল্লাহর কিতাব এবং জ্ঞানের অবশিষ্টাংশ অর্থ যদি নবী–রসূল ও নেক লোকদের রেখে যাওয়া জ্ঞান এই অর্থ গ্রহণ নাও করা হয় তাহলেও পৃথিবীর কোন জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ এবং দীনী বা দুনিয়াবী জ্ঞান–বিজ্ঞানের কোন বিশেষজ্ঞের গবেষণা ও বিশ্লেষণেও আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন ইংগিত দেয়া হয়নি যে, পৃথিবী বা আসমানের অমুক বস্তু খোদা সৃষ্টি করেননি, বরং অমুক বুজর্গ অথবা অমুক দেবতা সৃষ্টি করেছে অথবা এই বিশ্ব জাহানে মানুষ যেসব নিয়ামত ভোগ করছে তার মধ্যে অমুক নিয়ামতটি আল্লাহর নয়, অমুক উপাস্যের সৃষ্টি।

৫. জবাব দেয়ার অর্থ কার্যত জবাবী, তৎপরতা দেখানো, শুধু মুখে উচ্চস্বরে জবাব দেয়া কিংবা লিখিতভাবে জবাব পাঠিয়ে দেয়া নয়। অর্থাৎ কেউ যদি সেই উপাস্যদের কাছে নালিশ বা সাহায্য প্রার্থনা করে, কিংবা তাদের কাছে দোয়া করে তাহলে যেহেতু তাদের আদৌ কোন শক্তি ও কর্তৃত্ব নেই তাই তার আবেদনে কোন প্রকার ইতিবাচক বা নেতিবাচক বাস্তব তৎপরতা চালাতে সক্ষম নয়। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আয যুমার, টীকা ৩৩)

কিয়ামত পর্যন্ত জবাব না দিতে পারার অর্থ হচ্ছে, যত দিন পর্যন্ত এই পৃথিবী আছে ততদিন পর্যন্ত ব্যাপারটা ওখানেই স্থির থাকবে। অর্থাৎ সেই সব উপাস্যদের পক্ষ থেকে তাদের আবেদনের কোন জবাব পাওয়া যাবে না। কিন্তু যখন কিয়ামত হবে তখন ব্যাপারটা আরো অগ্রসর হয়ে এই দাঁড়াবে যে, সেই সব উপাস্যরা উল্টা এসব উপাসনাকারীদের দুশমন হয়ে যাবে। পরের আয়াতে একথাই বলা হয়েছে।

৬. অর্থাৎ এসব আহবানকারীদের আহবান আদৌ তাদের কাছে পৌঁছে না। না তারা নিজের কানে তা শোনে, না অন্য কোন সূত্রে তাদের কাছে এ খবর পৌঁছে যে পৃথিবীতে কেউ তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছে। আল্লাহর এ বাণীকে আরো পরিষ্কার করে এভাবে বুঝুন ঃ সারা পৃথিবীর মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া যেসব সত্তার কাছে প্রার্থনা করছে

তারা তিনভাগে বিভক্ত। এক, প্রাণহীন ও জ্ঞান-বুদ্ধিহীন সৃষ্টি। দুই, অতীতের বুযর্গ মানুষেরা। তিন, সেই সব পথভ্রষ্ট মানুষ যারা নিজেরাও নষ্ট ছিল এবং অন্যদেরও নষ্ট করে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছিলো। প্রথম প্রকারের উপাস্যদের তাদের উপাসনাকারীদের উপাসনা সম্পর্কে অনবহিত থাকা সুস্পষ্ট। এরপর থাকে দ্বিতীয় প্রকারের উপাস্য যারা ছিল আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী মানুষ। এদের অনবহিত থাকার কারণ দু'টি। একটি কারণ হচ্ছে, তারা আল্লাহর কাছে এমন একটি জগতে আছে যেখানে মানুষের আওয়াজ সরাসরি তাদের কাছে পৌছে না। আরেকটি কারণ হচ্ছে, যারা সারা জীবন যেসব মানুষকে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা শিখিয়েছেন তারাই এখন উল্টা তাদের কাছে প্রার্থনা করছে আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতারা তাদের কাছে এ খবর পৌছিয়ে দেন না। কারণ, তাদের কাছে এই খবরের চেয়ে বেশী কষ্টদায়ক জিনিস আর কিছুই হতে পারে না। আল্লাহ তাঁর সেই নেক বান্দাদের কষ্ট দেয়া কখনো পসন্দ করেন না। এরপর তৃতীয় প্রকারের উপাস্যদের সম্পর্কে যদি চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন, তাদের অনবহিত থাকারও দুটি মাত্র কারণ। একটি কারণ হচ্ছে তারা আল্লাহর কাছে অপরাধী হিসেবে বিচারের অপেক্ষায় বন্দী। সেখানে দুনিয়ার কোন আবেদন-নিবেদন পৌছে না। আরেকটি কারণ হচ্ছে, আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতারাও তাদের এ খবর দেন না যে, পৃথিবীতে তোমাদের মিশন খুব সফলতা লাভ করেছে এবং তোমাদের মৃত্যুর পর মানুষ তোমাদেরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। কারণ এ খবর তাদের জন্য খুশীর কারণ হবে। অথচ আল্লাহ জালেমদের কখনো খুশী করতে চান না।

এ প্রসঙ্গে একথাও বুঝতে হবে যে, আল্লাহ তাঁর সৎ বান্দাদের কাছে দুনিয়ার মানুষের সালাম এবং তাদের রহমত কামনার দোয়া পৌছিয়ে দেন। কেননা এসব তাদের খুশীর কারণ হয়। একইভাবে তিনি অপরাধীদেরকে দুনিয়ার মানুষের অভিশাপ, ক্রোধ ও তিরস্কার সম্পর্কেও অবহিত করেন। যেমন একটি হাদীস অনুসারে বদর যুদ্ধে নিহত কাফেরদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরস্কার শুনানো হয়েছিলো। কারণ, তা ছিল তাদের জন্য কষ্টের ব্যাপার। কিন্তু যা নেককার বান্দাদের জন্য দুঃখ ও মনকষ্টের এবং অপরাধীদের জন্য আনন্দের কারণ হয় সে রকম বিষয় তাদের কাছে পৌছানো হয় না। এই ব্যাখ্যার সাহায্যে মৃতদের শুনতে পাওয়া সম্পর্কিত বিষয়টির তাৎপর্য অতি উত্তম রূপে সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

৭. অর্থাৎ তারা সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেবে, না আমরা কোন সময় তোমাদের একথা বলেছি যে, আমাদের ইবাদত করতে হবে, না আমাদের জানা আছে যে, এ লোকেরা আমাদের 'ইবাদত' করতো। এই গোমরাহীর জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। তাই তার পরিণাম তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। এ গুনাহে আমাদের কোন অংশ নেই।

৮. এর অর্থ হচ্ছে, যখন কুরআনের আয়াতসমূহ মক্কার কাফেরদের শুনানো হতো তখন তারা পরিষ্কার উপলব্ধি করতো যে, এ বাণীর মর্যাদা মানুষের কথার চাইতে অনেক গুণ বেশী। কুরআনের অতুলনীয় অলংকার সমৃদ্ধ ভাষা হৃদয় বিমুগ্ধকারী ভাষণ, উন্নত বিষয় বস্তু এবং হৃদয় উত্তপ্তকারী বর্ণনাভংগির সাথে তাদের কোন কবি, বক্তা এবং শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিকের সাহিত্য কর্মেরও কোন তুলনাই ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বাণীর মধ্যে যে উৎকর্ষতা ছিল নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের বাণীর মধ্যেও তা ছিল না। যারা শৈশব থেকে তাঁকে দেখে আসছিলো তারা কুরআনের ভাষা এবং তাঁর ভাষার মধ্যে কত বড় পার্থক্য ছিল তা ভাল করেই জানতো। এক ব্যক্তি, যে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে রাত দিন তাদের মাঝেই অবস্থান করে আসছে সে হঠাৎ কোন সময় এমন এক বাণী রচনা করে ফেলছে যার ভাষার তাঁর নিজের জানা ভাষার সাথে আদৌ কোন মিল নেই, একথা বিশ্বাস করা তাদের জন্য মোটেই সম্ভব ছিল না। এই জিনিসটি তাদের সামনে সত্যকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে তুলে ধরছিলো। কিন্তু তারা যেহেতু কুফরীকে আঁকড়ে ধরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো, তাই এই সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখেও এই বাণীকে অহীর বাণী হিসেবে মেনে নেয়ার পরিবর্তে বলতো যে, তা কোন যাদুর কারসাজি। (আরো যে দিকটি বিচার করে তারা কুরআনকে যাদু বলে আখ্যায়িত করতো তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আমরা ইতিপূর্বেই করেছি। দেখুন, তাফহীমূল কুরআন, সূরা আল আম্বিয়া, টীকা ৫; সূরা সোয়াদের তাফসীর, টীকা ৫)।

৯. এই প্রশ্নমূলক বর্ণনাভংগির মধ্যে অতি বিস্ময় পরিলক্ষিত হয়। এর অর্থ হচ্ছে, এরা কি এতই নির্লজ্জ যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে কুরআন নিজে রচনা করার অপবাদ আরোপ করে। অথচ এরা ভাল করেই জানে যে, এটা তাঁর রচিত বাণী হতে পারে না। তাছাড়া এ বাণীকে তাদের যাদু বলা পরিষ্কারভাবে একথাই স্বীকার করে নেয়া যে, এটা একটা অসাধারণ বাণী যা তাদের নিজেদের মতেও কোন মানুষের রচনা হওয়া সম্ভব নয়।

১০. তাদের অপবাদ যে ভিত্তিহীন এবং সরাসরি হঠকারিতামূলক তা যেহেতু সম্পূর্ণ স্পষ্ট ছিল তাই তার প্রতিবাদে যুক্তি প্রমাণ পেশ করার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। অতএব, শুধু একথা বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে, যদি প্রকৃতই আমি নিজে একটি বাণী রচনা করে তা আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করার মত মহা অপরাধ করে থাকি—যে অভিযোগে তোমরা আমাকে অভিযুক্ত করছো—তাহলে সে ক্ষেত্রে আমাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্য তোমরা আসবে না। কিন্তু এটা যদি আল্লাহরই বাণী হয়ে থাকে আর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তোমরা তা প্রতিরোধ করে থাকো তাহলে তোমাদের সাথে আল্লাহই বুঝাপড়া করবেন। প্রকৃত সত্য আল্লাহর অজানা নয়। সুতরাং মিথ্যা ও সত্যের ফায়সালার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। সারা পৃথিবী যদি কাউকে মিথ্যাবাদী বলে আর আল্লাহর কাছে সে সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবশ্যই তার পক্ষে হবে। আর গোটা পৃথিবী যদি কাউকে সত্যবাদী বলে কিন্তু আল্লাহর কাছে সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত সে মিথ্যাবাদীই সাব্যস্ত হবে। অতএব, আবোল তাবোল না বলে নিজের পরিণামের কথা চিন্তা করো।

১১. এখানে এ আয়াতাংশের দুটি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা। যারা আল্লাহর বাণীকে মিথ্যা বানোয়াট বলে আখ্যায়িত করতে কুন্ঠিত নয়, এই দয়া ও ক্ষমার কারণেই তারা পৃথিবীর বুকে বেঁচে আছে। কোন নির্দয় ও কঠোর আল্লাহ যদি এই বিশ্ব জাহানের মালিক হতেন তাহলে এরূপ ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারীদের একটি শ্বাস গ্রহণের পর আরেকটি শ্বাস গ্রহণের ভাগ্য হতো না। এ আয়াতাংশের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে এই যে, হে জালেমরা এখনো যদি এই হঠকারিতা থেকে বিরত হও তাহলে আল্লাহর

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾

এদের বলো, 'আমি কোন অভিনব রসূল নই। কাল তোমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে এবং আমার সাথেই বা কি আচরণ করা হবে তা আমি জানি না। আমি তো কেবল সেই অহীর অনুসরণ করি যা আমার কাছে পাঠানো হয় এবং আমি সুস্পষ্ট সাবধানকারী ছাড়া আর কিছুই নই।[১২] হে নবী (সা)। তাদের বলো, 'তোমরা কি কখনো একথা ভেবে দেখেছো, যদি এই বাণী আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসে থাকে আর তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করো (তাহলে তোমাদের পরিণাম কি হবে)?[১৩] এ রকম একটি বাণী সম্পর্কে তো বনী ইসরাঈলদের একজন সাক্ষী সাক্ষ্যও দিয়েছে। সে ঈমান এনেছে। কিন্তু তোমরা আত্মম্ভরিতায় ডুবে আছো।[১৪] এ রকম জালেমদের আল্লাহ হিদায়াত দান করেন না।"

রহমতের দরজা তোমাদের জন্য খোলা আছে এবং অদ্যাবধি তোমরা যা কিছু করেছো তা মাফ হতে পারে।

১২. এ বাণীর পটভূমি এই যে, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নিজেকে আল্লাহর রসূল হিসেবে পেশ করলেন তখন মক্কার লোকেরা একথা শুনে নানা রকম কথা বলতে শুরু করলো। তারা বলতো ঃ এ আবার কেমন রসূল যার সন্তানাদি আছে, যে বাজারে যায়, পানাহার করে এবং আমাদের মত মানুষের ন্যায় জীবন যাপন করে। তাহলে তার মধ্যে আলাদা কি বৈশিষ্ট আছে যে দিক দিয়ে সে সাধারণ মানুষের চেয়ে ভিন্ন এবং যার ফলে আমরাও বুঝতে পারবো যে, আল্লাহ বিশেষভাবে এই ব্যক্তিকেই তাঁর রাসূল বানিয়েছেন? তারা আরো বলতো, আল্লাহ যদি এই ব্যক্তিকেই তাঁর রসূল বানাতেন তাহলে তার আরদালী হিসেবে কোন ফেরেশতা পাঠাতেন। সেই ফেরেশতা ঘোষণা করতো, তিনি আল্লাহর াসূল। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে সামান্যতম বে-আদবীও করতো সে তাকেই শাস্তি স্বরূপ বেত্রাঘাত করতো। আল্লাহ যাকে তাঁর রাসূল হিসেবে নিয়োগ করবেন তাঁকে মক্কার অলিতে গলিতে এভাবে চলতে এবং সবরকম জুলুম-অত্যাচার বরদাশত করার জন্য অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবেন তা কি করে হতে পারে? আর কিছু না হলেও অন্তত এতটুকু হতো যে, আল্লাহ তাঁর রসূলের জন্য একটি জাঁকালো রাজ প্রাসাদ এবং একটি সবুজ-শ্যামল তরজাতা বাগান তৈরী করে দিতেন। তাহলে তাঁর রসূলের স্ত্রীর অর্থ-সম্পদ যখন নিঃশেষ হতো তখন তাঁর অভুক্ত থাকার মতো পরিস্থিতি আসতো না এবং তায়েফ

যাওয়ার জন্য সওয়ারী থাকতো না। এমন অবস্থাও দেখা দিতো না তাছাড়াও তারা তাঁর কাছে নানা ধরনের মু'জিযার দাবী করতো এবং গায়েবী বিষয়ে তাঁর কাছে জানতে চাইতো। তাদের ধারণায় কোন ব্যক্তির আল্লাহর রসূল হওয়ার অর্থ ছিল সে অতিমানবিক শক্তির মালিক হবে। তাঁর একটি ইংগিতে পাহাড় স্থানচ্যুত হবে, চোখের পলকে মরুভূমি শ্যামল শস্য ক্ষেতে পরিণত হবে, অতীত ও ভবিষ্যত সব কিছু তাঁর জানা থাকবে এবং অদৃশ্য সব কিছু তাঁর কাছে দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হবে।

আয়াতটির বিভিন্ন ছোট ছোট অংশে একথাগুলোরই জবাব দেয়া হয়েছে। এর প্রতিটি অংশের মধ্যেই ব্যাপক অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে।

একটি অংশে বলা হয়েছে, এদের বলো, "আমি অন্য রসূলদের থেকে ভিন্ন কোন রসূল নই।" অর্থাৎ আমাকে রসূল বানানো দুনিয়ার ইতিহাসে রসূল বানানোর প্রথম ঘটনা নয় যে, রসূল কি এবং কি নন তা বুঝতে তোমাদের কষ্ট হবে। আমার পূর্বে বহু রসূল এসেছিলেন। আমি তাদের থেকে আলাদা কিছু নই। পৃথিবীতে এমন কোন রসূল কখন এসেছেন যার সন্তানাদি ছিল না, কিংবা যিনি পানাহার করতেন না অথবা সাধারণ মানুষদের মত জীবন যাপন করতেন না? কোন্ রসূলের সাথে ফেরেশতা এসে তাঁর রিসালাতের ঘোষণা দিতো এবং তাঁর আগে আগে চাবুক হাতে চলতো? কোন্ রসূলের জন্য বাগান ও রাজ প্রাসাদ তৈরী করে দেয়া হয়েছে এবং আমি যে দুঃখ–কষ্ট বরদাশত করছি আল্লাহর পথে ডাকতে গিয়ে কে তা করেনি? এমন রসূল কে এসিছিলেন যিনি তাঁর ইচ্ছামত মু'জিযা দেখাতে পারতেন কিংবা নিজের জ্ঞান দিয়েই সব কিছু জানতেন? তাহলে শুধু আমার রিসালাত পরখ করে দেখার জন্য এই অভিনব ও স্বতন্ত্র মানদণ্ড তোমরা কোথা থেকে নিয়ে আসছো?

এর পরে বলা হয়েছে, জবাবে তাদের একথাও বলো, "কাল তোমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে এবং আমার সাথেই বা কি আচরণ করা হবে তা আমি জানি না।" আমি তো কেবল আমার কাছে প্রেরিত অহী অনুসরণ করি। অর্থাৎ আমি আলেমুল গায়েব নই যে, আমার কাছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সব কিছু সুস্পষ্ট থাকবে এবং দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসই আমার জানা থাকবে। তোমাদের ভবিষ্যত তো দূরের কথা আমার নিজের ভবিষ্যতও আমার জানা নেই। আমাকে অহীর মাধ্যমে যে জিনিস সম্পর্কে জ্ঞান দেয়া হয় আমি শুধু সেটাই জানি। এর চেয়ে বেশী জানার দাবী আমি কবে করেছিলাম? এমন জ্ঞানের অধিকারী রসূলই বা পৃথিবীতে কবে এসেছিলেন যে তোমরা আমার রিসালাত পরখ করার জন্য আমার গায়েবী জ্ঞানের পরীক্ষা নিতে চাচ্ছো। হারানো বস্তুর সন্ধান বলা, গর্ভবতী নারী পুত্র সন্তান প্রসব করবে না কণ্যা সন্তান এবং রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে না মারা যাবে এসব বলা কবে থেকে রসূলের কাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সব শেষে বলা হয়েছে, তাদের বলে দাও, "আমি সুস্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই নই।" অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী নই যে, তোমরা প্রতিনিয়ত আমার কাছে যে মু'জিযার দাবী করছো তা দেখিয়ে দেবো। আমাকে যে কাজের জন্য পাঠানো হয়েছে তা শুধু এই যে, আমি মানুষের সামনে সঠিক পথ পেশ করবো এবং যারা তা গ্রহণ করবে না তাদেরকে এর মন্দ পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করে দেবো।

১৩. এ বিষয়টি ইতিপূর্বে অন্যভাবে সূরা হা–মীম আস–সাজদার ৫২ আয়াতে বলা হয়েছে। ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, উল্লেখিত সূরার তাফসীর, টীকা ৬৯।

১৪. মুফাসসিরদের একটি বড় দল এই সাক্ষী বলতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালামকে বুঝিয়েছেন। তিনি মদীনার একজন বড় ইহুদী আলেম ছিলেন। তিনি হিজরতের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনেন। এ ঘটনা যেহেতু মদীনাতে সংঘটিত হয়েছিলো তাই মুফাসসিরদের মত হলো, এটি মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত। আয়াতটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো, হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্‌কাসের এই বর্ণনাই এ ব্যাখ্যার ভিত্তি। (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে জারীর)। এ কারণেই ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদা, দাহ্‌হাক, ইবনে সিরীন, হাসান বাসারী, ইবনে যায়েদ এবং 'আওফ ইবনে মালেক আল–আশজায়ীর মত কিছু সংখ্যক বড় বড় মুফাসসিরও এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অপর দিকে ইকরিমা, শাবী ও মাসরুক বলেন ঃ এ আয়াত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম সম্পর্কে হতে পারে না। কারণ, গোটা সূরাই মক্কায় অবতীর্ণ। ইবনে জারীর তাবারীও এ মতটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁর যুক্তি হলো, প্রথম থেকেই মক্কার মুশরিকদের উদ্দেশ করে ধারাবাহিকভাবে গোটা বক্তব্য চলে আসছে এবং পরের সবটুকু বক্তব্যও তাদের উদ্দেশেই পূর্বাপর এই প্রসংগের মধ্যে হঠাৎ মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত এসে যাওয়া কল্পনা করা যায় না। পরবর্তীকালের যেসব মুফাসসির এই দ্বিতীয় মতটি গ্রহণ করেছেন তারা হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্‌কাসের বর্ণনাটি প্রত্যাখ্যান করেন না। তারা মনে করেন, আয়াতটি যেহেতু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালামের ঈমান গ্রহণের ব্যাপারেও খাটে তাই হযরত সা'দ প্রাচীনদের অভ্যাস অনুসারে বলেছেন এটি আবদুল্লাহ ইবনে সালাম সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে, তিনি যখন ঈমান এনেছেন তখন এটি তাঁর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। বরং এর অর্থ হলো, এ আয়াত তাঁর বেলায়ও হুবহু ঠিক। তাঁর ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে এ আয়াত পুরোপুরি প্রযোজ্য।

বাহ্যত এই দ্বিতীয় মতটিই অধিক বিশুদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। এরপর আরো একটি প্রশ্নের সমাধান দেয়া দরকার যে, সাক্ষী বলতে এখানে কাকে বুঝানো হয়েছে? যেসব মুফাসসির এই দ্বিতীয় মতটি গ্রহণ করেছেন তাদের কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা মূসা আলাইহিস সালামকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী বাক্যাংশ, "সে ঈমান এনেছে। কিন্তু তোমরা আত্মম্ভরিতায় ডুবে আছো।"–এর এই ব্যাখ্যার সাথে কোন মিল নেই। মুফাসসির নিশাপুরী ও ইবনে কাসীর যে মত ব্যক্ত করেছেন সেটিই অধিক বিশুদ্ধ বলে মনে হয়। অর্থাৎ এখানে সাক্ষী অর্থ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি নয়, বরং বনী ইসরাঈলদের যে কোন সাধারণ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর বাণীর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, কুরআন তোমাদের সামনে যে শিক্ষা পেশ করছে তা কোন অভিনব জিনিস নয়। পৃথিবীতে প্রথমবারের মত শুধুমাত্র তোমাদের সামনেই তা পেশ করা হয়নি যে, তোমরা ওজর পেশ করে বলবে ঃ এ ধরনের কথা তো ইতিপূর্বে মানব জাতির কাছে আর আসেনি। তাই আমরা কি করে তা মানতে পারি। ইতিপূর্বেও এসব শিক্ষা এভাবেই অহীর মাধ্যমে বনী ইসরাঈলদের কাছে তাওরাত ও অন্যান্য আসমানী কিতাব রূপে এসেছিলো। বনী ইসরাঈলদের একজন সাধারণ মানুষও তা মেনে নিয়েছিলো এবং একথা স্বীকার করে নিয়েছিলো যে, অহীই হচ্ছে এসব শিক্ষা নাযিল হওয়ার মাধ্যম। তাই অহী এবং এই

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴿١١﴾ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَٰذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

২ রুকূ'

যারা মানতে অস্বীকার করেছে তারা মু'মিনদের সম্পর্কে বলে, এই কিতাব মেনে নেয়া যদি কোন ভাল কাজ হতো তাহলে এ ব্যাপারে এসব লোক আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হতে পারতো না।[১৫] যেহেতু এরা তা থেকে হিদায়াত লাভ করেনি তাই তারা অবশ্যই বলবে, এটা পুরনো মিথ্যা।[১৬] অথচ এর পূর্বে মূসার কিতাব পথ–প্রদর্শক ও রহমত হয়ে এসেছিলো। আর এ কিতাব তার সত্যায়নকারী, আরবী ভাষায় এসেছে যাতে জালেমদের সাবধান করে দেয়[১৭] এবং সৎ আচরণ গ্রহণ–কারীদের সুসংবাদ দান করে। যারা ঘোষণা করেছে আল্লাহই আমাদের রব, অতপর তার ওপরে স্থির থেকেছে নিশ্চয়ই তাদের জন্য কোন ভয় নেই এবং তারা মন মরা ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হবে না।[১৮] এ ধরনের সব মানুষ জান্নাতে যাবে। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে, তাদের সেই কাজের বিনিময়ে যা তারা পৃথিবীতে করেছিলো।

শিক্ষা দুর্বোধ্য জিনিস তোমরা সে দাবী করতে পার না। আসল কথা হলো, তোমাদের গর্ব, অহংকার এবং ভিত্তিহীন আত্মম্ভরিতা ঈমানের পথে অন্তরায়।

১৫. কুরাইশ নেতারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করার জন্য যেসব যুক্তি কাজে লাগাতো এটা তার একটা। তারা বলতো, 'এ কুরআন যদি সত্য হতো এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি একটি সঠিক জিনিসের দাওয়াত দিতেন তাহলে কওমের নেতারা, গোত্রসমূহের অধিপতিরা এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অগ্রসর হয়ে তা গ্রহণ করতো। এটা কি করে হতে পারে যে, কতিপয় অনভিজ্ঞ বালক এবং কিছু সংখ্যক নীচু পর্যায়ের ক্রীতদাস একটি যুক্তিসঙ্গত কথা মেনে নেবে কিন্তু কওমের গণ্যমান্য ব্যক্তি যারা জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ এবং আজ পর্যন্ত কওম যাদের জ্ঞান–বুদ্ধি ও ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করে আসছে তারা তা

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ
وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ
وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي
تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ
أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ
الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾

আমি মানুষকে এই মর্মে নির্দেশনা দিয়েছি যে, তারা যেন পিতা–মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে। তার মা কষ্ট করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছিলো এবং কষ্ট করেই তাকে প্রসব করেছিলো। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধপান করাতে ত্রিশ মাস লেগেছে।[১৯] এমন কি যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছেছে এবং তারপর চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়েছে তখন বলেছে ঃ "হে আমার রব, তুমি আমাকে ও আমার পিতা–মাতাকে যেসব নিয়ামত দান করেছো আমাকে তার শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক দাও। আর এমন সৎ কাজ করার তাওফীক দাও যা তুমি পসন্দ করো।[২০] আমার সন্তানদেরকে সৎ বানিয়ে আমাকে সুখ দাও। আমি তোমার কাছে তাওবা করছি। আমি নির্দেশের অনুগত (মুসলিম) বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।" এ ধরনের মানুষের কাছে থেকে তাদের উত্তম আমলসমূহ আমি গ্রহণ করে থাকি, তাদের মন্দ কাজসমূহ ক্ষমা করে দেই।[২১] যে প্রতিশ্রুতি তাদের দিয়ে আসা হয়েছে তা ছিলো সত্য প্রতিশ্রুতি। সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে এরা জান্নাতী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রত্যাখ্যান করবে? নতুন এই আন্দোলনে মন্দ কিছু অবশ্যই আছে। তাই কওমের গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তা মানছে না। অতএব, তোমরাও তা থেকে দূরে সরে যাও, এই প্রতারণা মূলক যুক্তি খাড়া করে তারা সাধারণ মানুষকে শান্ত করে রাখার চেষ্টা করতো।

১৬. অর্থাৎ এসব লোক নিজেরাই নিজেদেরকে হক ও বাতিলের মানদণ্ড গণ্য করে রেখেছে। এরা মনে করে, এরা যে হিদায়াতকে গ্রহণ করবে না তাকে অবশ্যই গোমরাহী

ও পথভ্রষ্টতা হতে হবে। কিন্তু এরা একে নতুন মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করার সাহস রাখে না। কারণ, এর আগের যুগের নবী–রসূলগণ এ শিক্ষাই পেশ করেছেন এবং আহলে কিতাবদের কাছে যেসব আসমানী কিতাব আছে তার সবই এ আকীদা–বিশ্বাস ও নির্দেশনায় ভরপুর। এ কারণে এরা একে পুরনো মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করে। যারা হাজার হাজার বছর ধরে এসব সত্য পেশ করে এসেছে এবং মেনেছে এদের মতে তারা সবাই জ্ঞান–বুদ্ধি থেকে বঞ্চিত। সমস্ত জ্ঞান শুধু এদের অংশেই পড়েছে।

১৭. অর্থাৎ সেই সব লোককে খারাপ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেবেন যারা আল্লাহর সাথে কুফরী এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যদের দাসত্ব করে নিজের এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতি জুলুম করছে এবং নিজের এই গোমরাহীর কারণে নৈতিক চরিত্র ও কর্মের এমন সব ত্রুটি–বিচ্যুতির মধ্যে ডুবে আছে যার ফলে মানব সমাজ নানা প্রকার জুলুম–অত্যাচার ও বে–ইনসাফীতে ভরে উঠেছে।

১৮. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা হা–মীম আস–সাজদা, টীকা ৩৩ থেকে ৩৫।

১৯. সন্তানদের যদিও মা–বাপ উভয়েরই সেবা করতে হবে কিন্তু গুরুত্বের দিক দিয়া মায়ের অধিকার এ কারণে বেশী যে, সে সন্তানের জন্য বেশী কষ্ট স্বীকার করে। এ আয়াত এ দিকেই ইংগিত করে। একটি হাদীস থেকেও এ বিষয়টি জানা যায়। কিছুটা শাব্দিক পার্থক্য সহ হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমদ এবং ইমাম বুখারীর আদাবুল মুফরাদে উল্লেখিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি নবীকে (সা) জিজ্ঞেস করলো, আমার ওপর কার খেদমতের হক সবচেয়ে বেশী? নবী (সা) বললেন ঃ তোমার মা'র; সে বললো ঃ তারপর কে? তিনি বললেন ঃ তোমার মা। সে জিজ্ঞেস করলো ঃ তারপর কে? তিনি বললেন ঃ তোমার মা। সে আবারো জিজ্ঞেস করলো ঃ তারপর কে? তিনি বললেন ঃ তোমার বাপ। নবীর (সা) এই বাণী হুবহু এ আয়াতেরই ব্যাখ্যা। কারণ, এতেও মায়ের তিনগুণ বেশী অধিকারের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে ঃ (১) কষ্ট করে মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে। (২) কষ্ট করেই তাকে প্রসব করেছে এবং (৩) গর্ভধারণ ও দুধ পান করাতে ৩০ মাস লেগেছে।

এ আয়াত, সূরা লোকমানের ১৪ আয়াত এবং সূরা বাকারার ২৩৩ আয়াত থেকে আরো একটি আইনগত বিষয় পাওয়া যায়। একটি মামলায় হযরত আলী ও হযরত ইবনে আব্বাস সেই বিষয়টিই তুলে ধরেছিলেন এবং তার ওপর ভিত্তি করে হযরত উসমান (রা) তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছিলেন। ঘটনাটা হচ্ছে, হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত যুগে এক ব্যক্তি জুহায়না গোত্রের একটি মেয়েকে বিয়ে করে এবং বিয়ের ছয় মাসের মধ্যেই তার গর্ভ থেকে একটি সুস্থ ও ত্রুটিহীন শিশু ভুমিষ্ঠ হয়। লোকটি হযরত উসমানের কছে ঘটনাটা পেশ করে। তিনি উক্ত মহিলাকে ব্যভিচারিনী ঘোষণা করে তাকে রজম করার নির্দেশ দেন। হযরত আলী (রা) এই ঘটনা শোনা মাত্র হযরত উসমানের (রা) কাছে পৌঁছেন এবং বলেন ঃ আপনি এ কেমন ফায়সালা করলেন? জবাবে হযরত উসমান বললেন, বিয়ের ছয় মাস পরেই সে জীবিত ও সুস্থ সন্তান প্রসব করেছে। এটা কি তার ব্যভিচারিনী হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ নয়? হযরত আলী (রা) বললেন ঃ না এর পর তিনি কুরআন মজীদের উপরোক্ত আয়াত তিনটি ধারাবাহিকভাবে পাঠ করলেন। সূরা বাকরায়

আল্লাহ বলছেন ঃ "যে পিতা দুধ পানের পূর্ণ সময় পর্যন্ত দুধ পান করাতে চায় মায়েরা তার সন্তানকে পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে।" সূরা লোকমানে বলেছেন ঃ "তার দুধ ছাড়তে দুই বছর লেগেছে। সূরা আহক্বাফে বলেছেন ঃ "তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধ পান করাতে ত্রিশ মাস লেগেছে।" এখন ত্রিশ মাস থেকে যদি দুধ পানের দুই বছর বাদ দেয়া হয় তাহলে গর্ভ ধারণকাল ছয় মাস মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এ থেকে জানা যায়, গর্ভ ধারণের স্বল্পতম মেয়াদ ছয় মাস। এই সময়ের মধ্যে সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হতে পারে। অতএব, যে মহিলা বিয়ের ছয় মাস পরে সন্তান প্রসব করেছে তাকে ব্যভিচারিনী বলা যায় না। হযরত আলীর (রা) এই যুক্তি–প্রমাণ শুনে হযরত উসমান বললেন ঃ আমার মন–মস্তিষ্কে এ বিষয়টি আদৌ আসেনি। এরপর তিনি মহিলাটিকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। একটি বর্ণনাতে আছে, হযরত ইবনে আব্বাসও এ বিষয়ে হযরত আলীর মতকে সমর্থন করেছিলেন এবং তারপর হযরত উসমান তাঁর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছিলেন (ইবনে জারীর, আহকামুল কুরআন জাসসাস, ইবনে কাসীর)।

এ তিনটি আয়াত একত্রিত করে পাঠ করলে যেসব আইনগত বিধান পাওয়া যায় তা হচ্ছে ঃ

এক ঃ যে মহিলা বিয়ের পর ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করবে (অর্থাৎ তা যদি গর্ভপাত না হয়, বরং স্বাভাবিক প্রসব হয়) সে ব্যভিচারিনী সাব্যস্ত হবে এবং তার স্বামীর বংশ পরিচয়ে তার সন্তান পরিচিত হবে না।

দুই ঃ যে মহিলা বিয়ের ছয় মাস পর বা তার চেয়ে বেশী সময় পর জীবিত ও সুস্থ সন্তান প্রসব করবে শুধু এই সন্তান প্রসব করার কারণে তাকে ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করা যাবে না। তার স্বামীকে তার প্রতি অপবাদ আরোপের অধিকার দেয়া যেতে পারে না এবং তার স্বামী ঐ সন্তানের বংশ পরিচয় অস্বীকার করতে পারে না। সন্তান তারই বলে স্বীকার করা হবে এবং মহিলাকে শাস্তি দেয়া যাবে না।

তিন ঃ দুধপান করানোর সর্বাধিক মেয়াদ দুই বছর। এই বয়সের পর যদি কোন শিশু কোন মহিলার দুধ পান করে তাহলে সে তার দুধ মা হবে না এবং সূরা নিসার ২৩ আয়াতে দুধ পানের যে বিধি–বিধান বর্ণিত হয়েছে তাও এই ধরনের দুধপানের বেলায় প্রযোজ্য হবে না। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা অধিক সতর্কতার জন্য দুই বছরের পরিবর্তে আড়াই বছরের মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন যাতে দুধপান করানোর কারণে যে সব বিষয় হারাম হয় সেই সব নাজুক বিষয়ে ভুল করার সম্ভাবনা না থাকে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা লোকমান, টীকা ২৩)

এখানে এ বিষয়টির অবগতি বে–ফায়েদা হবে না যে, সর্বাধুনিক মেডিকেল গবেষণা অনুসারে একটি শিশুকে পরিপুষ্টি ও পরিবৃদ্ধি লাভ করে জীবন্ত ভূমিষ্ঠ হওয়ার উপযোগী হতে হলে কমপক্ষে ২৮ সপ্তাহ মাতৃগর্ভে অবস্থান প্রয়োজন। এটা সাড়ে ছয় মাস সময়কালের সামান্য বেশী। ইসলামী আইনে আরো প্রায় অর্ধ মাস সুযোগ দেয়া হয়েছে। কারণ, একজন মহিলার ব্যভিচারিনী প্রমাণিত হওয়া এবং একটি শিশুর বংশ পরিচয় থেকে বঞ্চিত হওয়া বড় গুরুতর ব্যাপার। মা ও শিশুকে আইনগত এই কঠিন পরিণাম থেকে রক্ষা করার জন্য বিষয়টির নাজুকতা আরো বেশী সুযোগ পাওয়ার দাবী করে।

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَآ أَتَعِدَانِنِيٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ
الْقُرُونُ مِن قَبْلِي ۚ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ ۚ إِنَّ وَعْدَ
اللَّهِ حَقٌّ ۚ فَيَقُولُ مَا هَٰذَآ إِلَّآ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾ أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ حَقَّ
عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ
إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿١٨﴾

আর যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বললো : "আহ্! তোমরা বিরক্তির একশেষ করে দিলে। তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাচ্ছো যে, মৃত্যুর পর আমি আবার কবর থেকে উত্তোলিত হবো? আমার পূর্বে তো আরো বহু মানুষ চলে গেছে। (তাদের কেউ তো জীবিত হয়ে ফিরে আসেনি।)।" মা-বাপ আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলে : "আরে হতভাগা, বিশ্বাস কর। আল্লাহর ওয়াদা সত্য।" কিন্তু সে বলে, "এসব তো প্রাচীনকালের বস্তাপচা কাহিনী" এরাই সেই সব লোক যাদের ব্যাপারে আযাবের সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। এদের পূর্বে জিন ও মানুষদের মধ্য থেকে (এই প্রকৃতির) যেসব ক্ষুদ্র দল অতীত হয়েছে এরাও গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হবে। নিশ্চয়ই এরা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার লোক।[২২]

তাছাড়া গর্ভ কোন্ সময় স্থিতি লাভ করেছে তা কোন ডাক্তার, কোন বিচারক এবং এমনকি মহিলা নিজে এবং তাকে গর্ভদানকারী পুরুষও সঠিকভাবে জানতে পারে না। এ বিষয়টিও গর্ভধারণের স্বল্পতম আইনগত মেয়াদ নির্ধারণে আরো কয়েক দিনের অবকাশ দাবী করে।

২০. অর্থাৎ আমাকে এমন সৎ কাজ করার তাওফীক দান করো যা বাহ্যিক দিক দিয়েও অবিকল তোমার বিধান মোতাবেক হবে এবং বাস্তবেও তোমার কাছে গৃহীত হওয়ার উপযুক্ত হবে। কোন কাজ যদি দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টিতে খুব ভালও হয়, কিন্তু তাতে যদি আল্লাহর আইনের আনুগত্য না করা হয়, তাহলে দুনিয়ার মানুষ তার যত প্রশংসাই করুক না কেন আল্লাহর কাছে তা আদৌ কোন প্রশংসার যোগ্য হতে পারে না। অপরদিকে একটা কাজ যদি অবিকল শরীয়ত মোতাবেক হয় এবং তার বাহ্যিক রূপ ও কাঠামোতে ত্রুটি নাও থাকে, কিন্তু অসৎ নিয়ত, প্রদর্শনীর মনোভাব, আত্মতুষ্টি, গর্ব ও অহংকার এবং স্বার্থ লোভ তাকে ভেতর থেকে অন্তসারশূন্য করে দেয়, এমন কাজও আল্লাহর কাছে গৃহীত হওয়ার যোগ্য থাকে না।

২১. অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে যত বেশী ভাল কাজ করেছে আখেরাতে সেই অনুপাতে তাদের মর্যাদা নিরূপণ করা হবে। তবে তাদেরকে পদস্খলন, দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির

وَلِكُلٍّ دَرَجَٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۟ ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَٰلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَٰتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾

উভয় দলের প্রত্যেক মানুষের মর্যাদা হবে তাদের কর্ম অনুযায়ী। যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেন। তাদের প্রতি মোটেই জুলুম করা হবে না।[২৩] *অতপর এসব কাফেরদের যখন আগুনের সামনে এনে দাঁড় করানো হবে তখন তাদের বলা হবে, 'তোমরা নিজের অংশের নিয়ামতসমূহ দুনিয়ার জীবনেই ভোগ করে নিঃশেষ করে ফেলোছো এবং তা ভোগ করেছো। কোন অধিকার ছাড়াই তোমরা পৃথিবীতে যে বড়াই করতে থেকেছো এবং যে নাফরমানি করেছো সে কারণে আজ তোমাদের লাঞ্ছনাকর আযাব দেয়া হবে।*[২৪]

জন্য পাকড়াও করা হবে না। এটা ঠিক তেমনি যেমন কোন মহত হৃদয়, উদার ও মর্যাদাবোধ সম্পন্ন মনিব তার অনুগত ও বিশ্বস্ত চাকরকে ছোট ছোট সেবা ও খেদমতের নিরিখে মূল্যায়ন করে না বরং তার এমন কোন কাজের বিচারে মূল্যায়ন করে যে ক্ষেত্রে সে বড় কোন কৃতিত্ব দেখিয়েছে কিংবা জীবনপাত ও বিশ্বস্ততার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে। এ রকম খাদেমের ছোট ছোট ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরে সে তার সমস্ত সেবাকে খাটো করে দেখানোর মত আচরণ করে না।

২২. এখানে দুই রকম চরিত্র পাশাপাশি রেখে শ্রোতাদেরকে যেন নিঃশব্দ এই প্রশ্ন করা হয়েছে যে, বলো, এ দুটি চরিত্রের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম? সমাজে সেই সময় পাশাপাশি এই দুটি চরিত্রই বিদ্যমান ছিল। প্রথম প্রকার চরিত্রের অধিকারী কারা এবং দ্বিতীয় প্রকার চরিত্রের অধিকারী কারা তা জানা মানুষের জন্য আদৌ কঠিন ছিল না। এটা কুরাইশ নেতাদের এই উক্তির জবাব যে, এই কিতাব মেনে নেয়া যদি কোন ভাল কাজ হতো তাহলে এই কতিপয় যুবক ও ক্রীতদাস এ ব্যাপারে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হতে পারতো না। এই জবাবের আলোকে প্রতিটি মানুষ নিজেই বিচার করে দেখতে পারতো কিতাব মান্যকারীদের চরিত্র কি এবং অমান্যকারীদের চরিত্র কি?

২৩. অর্থাৎ না ভাল লোকদের ত্যাগ ও কুরবানী নষ্ট হবে না মন্দ লোকদেরকে তাদের প্রকৃত অপরাধের অধিক শাস্তি দেয়া হবে। সৎ ব্যক্তি যদি তার পুরস্কার থেকে বঞ্চিত থাকে কিংবা প্রকৃত প্রাপ্যের চেয়ে কম পুরস্কার পায় তাহলে তা জুলুম। আবার খারাপ লোক যদি তার কৃত অপরাধের শাস্তি না পায় কিংবা যতটা অপরাধ সে করেছে তার চেয়ে বেশী শাস্তি পায় তাহলে সেটাও জুলুম।

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ۭ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖٓ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۭ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٢١﴾ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٢﴾

৩ রুকূ’

এদেরকে ‘আদের ভাই (হূদ)–এর কাহিনী কিছুটা শুনাও যখন সে আহক্বাফে তার কওমকে সতর্ক করেছিলো[২৫] –এ ধরনের সতর্ককারী পূর্বেও এসেছিলো এবং তার পরেও এসেছে—যে আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করো না। তোমাদের ব্যাপারে আমার এক বড় ভয়ংকর দিনের আযাবের আশংকা আছে। তারা বললো ঃ “তুমি কি এ জন্য এসেছো যে, আমাদের প্রতারিত করে আমাদের উপাস্যদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে দেবে? ঠিক আছে, তুমি যদি প্রকৃত সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আমাদের যে আযাবের ভীতি প্রদর্শন করে থাকো তা নিয়ে এসো।”

২৪. তারা যেমন বড়াই ও গর্ব করেছে লাঞ্ছনাকর আযাব হবে সেই অনুপাতে। তারা নিজেদের বড় একটা কিছু বলে মনে করতো। তাদের ধারণা ছিল রসূলের প্রতি ঈমান এনে গরীব ও অভাবী মু’মিনদের দলে শামিল হওয়া তাদের মর্যাদার চেয়ে নীচুমানের কাজ। তারা ভেবেছিলো, কতিপয় ক্রীতদাস ও সহায় সম্বলহীন মানুষ যে জিনিস বিশ্বাস করেছে আমাদের মত গণ্যমান্য লোকেরা যদি তা বিশ্বাস করে তাহলে তাতে আমাদের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হবে। এ কারণে আখেরাতে আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন এবং তাদের গর্ব ও অহংকার মাটিতে মিশিয়ে দেবেন।

২৫. যেহেতু কুরাইশ নেতারা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা পোষণ করতো এবং নিজেদের সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য ও মোড়লিপনার কারণে আনন্দে আত্মহারা ছিল তাই এখানে তাদেরকে আদ কওমের কাহিনী শুনানো হচ্ছে। আরবে আদ জাতি এভাবে পরিচিত ছিল যে, প্রাচীনকালে এই ভূখণ্ডে তারা ছিল সর্বাধিক শক্তিশালী কওম।

احقاف শব্দটি حقف শব্দের বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ বালুর এমন সব লম্বা লম্বা টিলা যা উচ্চতায় পাহাড়ের সমান নয়। পারিভাষিক অর্থে এটা আরব মরুভূমির (الربع الخالى) দক্ষিণ পশ্চিম অংশের নাম, বর্তমানে যেখানে কোন জনবসতি নেই। পরের পৃষ্ঠায় মানচিত্রে এর অবস্থান দেখুন ঃ

ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুসারে আদ কওমের আবাস ভূমি ওমান থেকে ইয়ামান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর কুরআন মজীদ আমাদের বলছে, তাদের আদি বাসস্থান ছিল আল–আহক্বায । এখান থেকে বেরিয়ে তারা আশেপাশের দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়েছিলো
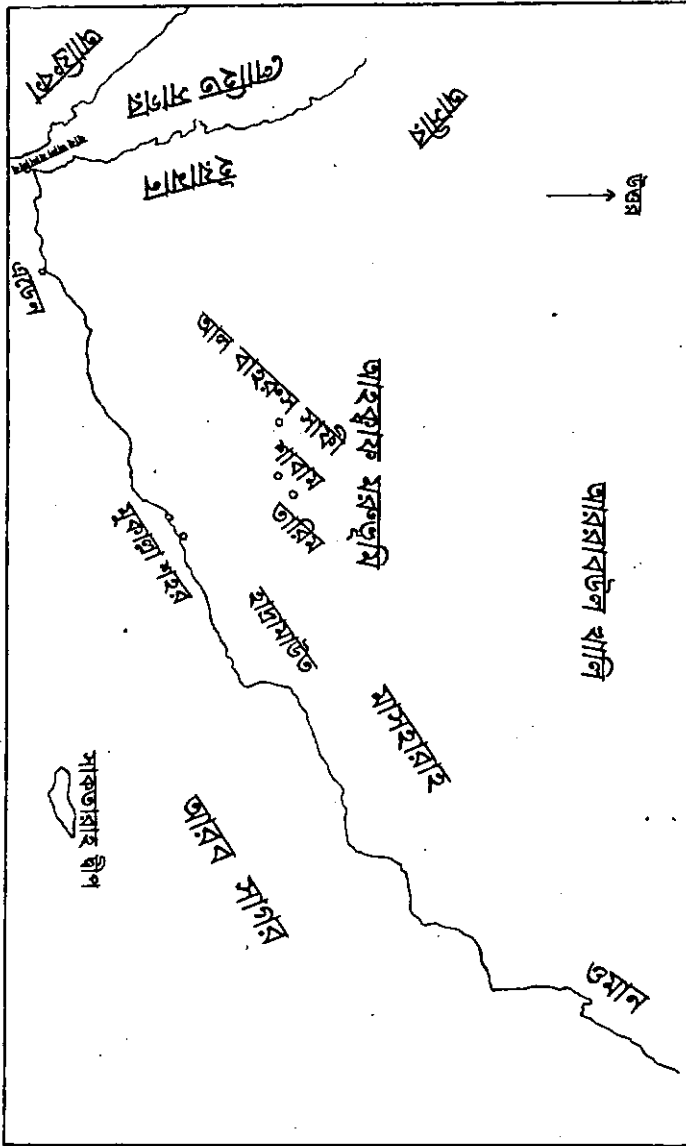
এবং দুর্বল জাতিসমূহকে গ্রাস করে ফেলেছিলো। বর্তমান কাল পর্যন্তও দক্ষিণ আরবের অধিবাসীদের মধ্যে একথা ছড়িয়ে আছে যে, এ এলাকাই ছিল আদ জাতির আবাস ভূমি। বর্তমানে "মুকাল্লা" শহর থেকে উত্তর দিকে ১২৫ মাইল দূরত্বে হাদ্রামাউতের একটি স্থানে লোকেরা হযরত হুদের (আ) মাযার তৈরী করে রেখেছে। সেটি হূদের কবর নামেই বিখ্যাত। প্রতি বছর ১৫ই শা'বান সেখানে 'উরস' হয়। আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাজার হাজার লোক সেখানে সমবেত হয়। যদিও ঐতিহাসিকভাবে এ কবরটি হূদের কবর

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾

সে বললো ঃ এ ব্যাপারের জ্ঞান শুধু আল্লাহরই আছে।[২৬] যে পয়গাম দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে আমি শুধু সেই পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি। তবে আমি দেখছি, তোমরা অজ্ঞতা প্রদর্শন করছো।[২৭] পরে যখন তারা সেই আযাবকে তাদের উপত্যকার দিকে আসতে দেখলো, বলতে শুরু করলো ঃ এই তো মেঘ, আমাদের 'ওপর প্রচুর বারিবর্ষণ করবে–না',[২৮] এটা বরং সেই জিনিস যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে। এটা প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস, যার মধ্যে কষ্টদায়ক আযাব এগিয়ে আসছে।

হিসেবে প্রমাণিত নয়। কিন্তু সেখানে তা নির্মাণ করা এবং দক্ষিণ আরবের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কম করে হলেও এতটুকু অবশ্যই প্রমাণ করে যে, আঞ্চলিক ঐতিহ্য এই এলাকাকেই আদ জাতির এলাকা বলে চিহ্নিত করে। এছাড়া হাদ্রামাউতে এমন কতিপয় ধ্বংসাবশেষ (Ruins) আছে যেগুলোকে আজ পর্যন্ত স্থানীয় অধিবাসীরা আদের আবাসভূমি বলে আখ্যায়িত করে থাকে।

আহক্বাফ অঞ্চলের বর্তমান অবস্থা দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে, এক সময় এখানে জাঁকালো সভ্যতার অধিকারী একটি শক্তিশালী জাতি বাস করতো। সম্ভবত হাজার হাজার বছর পূর্বে এটা এক উর্বর অঞ্চল ছিল। পরে আবহাওয়ার পরিবর্তন একে মরুভূমিতে পরিণত করেছে। বর্তমানে এই এলাকা একটি বিশাল মরুভূমি, যার আভ্যন্তরীণ এলাকায় যাওয়ার সাহসও কারো নেই। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ব্যাভেরিয়ার একজন সৈনিক এর দক্ষিণ প্রান্ত সীমায় পৌঁছেছিলো। তার বক্তব্য হলো ঃ যদি হাদ্রামাউতের উত্তরাঞ্চলের উচ্চ ভূমিতে দাঁড়িয়ে দেখা যায়, তাহলে বিশাল এই মরুপ্রান্তর এক হাজার ফুট নীচুতে দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে মাঝে মাঝে এমন সাদা ভূমিখণ্ড আছে যেখানে কোন বস্তু পতিত হলে তা বালুকা রাশির নীচে তলিয়ে যেতে থাকে এবং একেবারে পচে খসে যায়। আরব বেদুইনরা এ অঞ্চলকে ভীষণ ভয় করে এবং কোন কিছুর বিনিময়েই সেখানে যেতে রাজি হয় না। এক পর্যায়ে বেদুইনরা তাকে সেখানে নিয়ে যেতে রাজি না হলে সে একাই সেখানে চলে যায়। তার বর্ণনা অনুসারে এখানকার বালু একেবারে মিহিন পাউডারের মত। সে দূর থেকে তার মধ্যে একটি দোলক নিক্ষেপ করলে ৫ মিনিটের মধ্যেই তা তলিয়ে যায় এবং যে রশির সাথে তা বাঁধা ছিল তার প্রান্ত গলে যায়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন ঃ

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ
نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ
سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ
وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ
بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٢٦﴾

তার রবের নির্দেশে প্রতিটি বস্তুকে ধ্বংস করে ফেলবে। অবশেষে তাদের অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, তাদের বসবাসের স্থান ছাড়া সেখানে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হতো না। এভাবেই আমি অপরাধীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।[২৯] আমি তাদেরকে এমন কিছু দিয়েছিলাম যা তোমাদের দেইনি।[৩০] আমি তাদেরকে কান, চোখ, হৃদয়–মন সব কিছু দিয়েছিলাম। কিন্তু না সে কান তাদের কোন কাজে লেগেছে, না চোখ, না হৃদয়–মন। কারণ, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো।[৩১] তারা সেই জিনিসের পাল্লায় পড়ে গেল যা নিয়ে তারা ঠাট্টা–বিদ্রূপ করতো।

- Arabia and the Isles, Harold Ingram, London, 1946.
The unveiling of Arabia. R. H. Kirnan, London, 1937.
The Empty quarter, Phiby. London, 1933.

২৬. অর্থাৎ কবে তোমাদের ওপর আযাব আসবে তা শুধু আল্লাহই জানেন। তোমাদের ওপর কবে আযাব নাযিল করতে হবে এবং কতদিন পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দেয়া হবে তার ফায়সালা করা আমার কাজ নয়।

২৭. অর্থাৎ নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে আমার এই সতর্কীকরণকে তোমরা তামাশার বস্তু বলে মনে করছো এবং খেলার সামগ্রীর মত আযাবের দাবী করে চলেছো। আল্লাহর আযাব যে কি ভয়াবহ জিনিস সে ধারণা তোমাদের নেই। তোমাদের আচরণের কারণে তা যে তোমাদের কাছে এসে গেছে সে বিষয়েও তোমরা অবগত নও।

২৮. এখানে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট নয় যে, কে তাদেরকে এই জবাব দিয়েছিলো। বক্তব্যের ধরন থেকে আপনাআপনি এ ইংগিত পাওয়া যায় যে, সেই সময় বাস্তব পরিস্থিতি তাদেরকে কার্যত যে জবাব দিয়েছিলো এটা ছিল সেই জবাব। তারা মনে করেছিলো এটা বৃষ্টির মেঘ, তাদের উপত্যকাসমূহ বর্ষণসিক্ত করার জন্য আসছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ছিল প্রচণ্ড ঝড়–তুফান, যা তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য এগিয়ে আসছিলো।

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا
آلِهَةً ۖ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ۚ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٨﴾
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوهُ
قَالُوا أَنصِتُوا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾

৪ রুকূ'

আমি তোমাদের আশে পাশের এলাকায় বহু সংখ্যক জনপদ ধ্বংস করেছি। আমি আমার আয়াতসমূহ পাঠিয়ে বার বার নানাভাবে তাদের বুঝিয়েছি, হয়তো তারা বিরত হবে। কিন্তু আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব সত্তাকে তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিলো[৩২] তারা কেন তাদেরকে সাহায্য করলো না। বরং তারা তাদের থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিলো। এটা ছিল তাদের মিথ্যা এবং মনগড়া আকীদা-বিশ্বাসের পরিণাম, যা তারা গড়ে নিয়েছিলো।

(আর সেই ঘটনাও উল্লেখযোগ্য) যখন আমি জিনদের একটি দলকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছিলাম, যাতে তারা কুরআন শোনে।[৩৩] যখন তারা সেইখানে পৌছলো (যেখানে তুমি কুরআন পাঠ করছিলে) তখন পরস্পরকে বললো ঃ চুপ করো। যখন তা পাঠ করা শেষ হলো তখন তারা সতর্ককারী হয়ে নিজ কওমের কাছে ফিরে গেল।

২৯. আদ জাতির কাহিনী বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আ'রাফ, টীকা ৫১ থেকে ৫৬; হূদ, টীকা ৫৪ থেকে ৬৫; আল মু'মিনুন, টীকা ৩৪ থেকে ৩৭; আশ শূআরা, টীকা ৮৮ থেকে ৯৪; আল আনকাবূত, টীকা ৬৫; হা-মীম আস সাজদা, টীকা ২০ ও ২১।

৩০. অর্থাৎ অর্থ, সম্পদ, শক্তি, ক্ষমতা কোন বিষয়েই তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোন তুলনা হয় না। তোমাদের ক্ষমতার ব্যাপ্তি মক্কা শহরের বাইরে কোথাও নেই। কিন্তু তারা পৃথিবীর একটি বড় অংশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলো।

৩১. এই সংক্ষিপ্ত আয়াতাংশে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহর আয়াতসমূহই সেই জিনিস যা মানুষকে প্রকৃত সত্যের সঠিক উপলব্ধি ও জ্ঞান দান করে। মানুষের যদি এই জ্ঞান ও উপলব্ধি থাকে তাহলে সে চোখ দিয়ে টিকমত দেখতে পায়,

কান দিয়ে ঠিকমত শুনতে পায় এবং মন ও মস্তিষ্ক দিয়ে চিন্তা করতে ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু সে যখন আল্লাহর আয়াতসমূহ মানতে অস্বীকার করে তখন চোখ থাকা সত্ত্বেও ন্যায় ও সত্যকে চেনার মত দৃষ্টি লাভের সৌভাগ্য তার হয় না, কান থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি উপদেশ–বাণী শোনার বেলায় সে বধির হয় এবং মন ও মগজের যে নিয়ামত আল্লাহ তাকে দিয়েছেন তা দিয়ে সে উল্টা চিন্তা করে এবং একের পর এক ভ্রান্ত পরিণতির সম্মুখীন হতে থাকে। এমন কি তার সমস্ত শক্তি নিজের ধ্বংসসাধনেই ব্যয়িত হতে থাকে।

৩২. অর্থাৎ তারা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ঐ সব সত্তার সাথে ভক্তি শ্রদ্ধার সূচনা করেছিলো যে, এরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা। এদের অসীলায় আমরা আল্লাহর কাছে পৌছতে পারবো। কিন্তু এভাবে অগ্রসর হতে হতে তারা ঐ সব সত্তাকেই উপাস্য বানিয়ে নেয়। সাহায্যের জন্য তাদেরকেই ডাকতে থাকে, তাদের কাছেই প্রার্থনা করতে শুরু করে এবং তাদের সম্পর্কে এ বিশ্বাস পোষণ করতে থাকে যে, তারাই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মালিক, তাদের সাহায্যের আবেদনে তারাই সাড়া দেবে এবং বিপদ থেকে উদ্ধার তারাই করবে। তাদেরকে এই গোমরাহী থেকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ রসূলদের মাধ্যমে তাঁর আয়াত সমূহ পাঠিয়ে নানাভাবে তাদের বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তারা এই মিথ্যা খোদাদের দাসত্ব করতে বদ্ধপরিকর থাকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে এদেরকেই আঁকড়ে ধরে থাকার ব্যাপারে একগুঁয়েমি করতে থাকে। এখন বলো, যখন এই মুশরিক কওমের ওপর তাদের গোমরাহীর কারণে আল্লাহর আযাব আসলো তখন তাদের বিপদ ত্রাণকর্তা ও প্রার্থনা শ্রবণকারী উপাস্যরা কোথায় মরে পড়ে ছিলো? সেই দুর্দিনে তারা তাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসলো না কেন?

৩৩. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত যুবায়ের ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং হযরত হাসান বাসারী, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, যার ইবনু হুবায়েশ, মুজাহিদ, ইকরিমা ও অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিগণ থেকে যেসব বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে তা থেকে দেখা যায় তাঁরা সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, এ আয়াতে জিনদের প্রথম উপস্থিতির যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তা 'নাখলা' উপত্যকায় ঘটেছিলো। ইবনে ইসহাক, আবু নু'আইম ইসপাহানী এবং ওয়াকেদীর বর্ণনা অনুসারে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তায়েফ থেকে নিরাশ হয়ে মক্কায় ফেরার পথে নাখলা প্রান্তরে অবস্থান করেছিলেন এটা তখনকার ঘটনা। সেখানে এশা, ফজর কিংবা তাহাজ্জদের নামাযে তিনি কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। সেই সময় জিনদের একটি দল সে স্থান অতিক্রম করছিলো। তারা নবীর (সা).কিরায়াত শোনার জন্য থেমে পড়েছিলো। এর সাথে সাথে সমস্ত বর্ণনা এ ব্যাপারেও একমত যে, জিনেরা সেই সময় নবীর (সা) সামনে আসেনি, কিংবা তিনিও তাদের আগমন অনুভব করেননি। পরে আল্লাহ তাঁকে তাদের আগমনের এবং কুরআন তিলাওয়াত শোনার বিষয় অবহিত করেন।

যেখানে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো সে স্থানটি ছিল اَلزَّيْمَه অথবা اَلسَّيْلُ الْكَبِيْر কারণ এ দুটি স্থানই নাখলা প্রান্তরে অবস্থিত। উভয় স্থানেই পানি ও উর্বরতা বিদ্যমান। তায়েফ থেকে আগমনকারীকে যদি তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করতে হয়

قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٣٠﴾ يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣١﴾

তারা গিয়ে বললো ঃ হে আমাদের কওমের লোকজন! আমরা এমন কিতাব শুনেছি যা মূসার পরে নাযিল করা হয়েছে। যা ইতিপূর্বেকার সমস্ত কিতাবকে সমর্থন করে, ন্যায় ও সঠিক পথপ্রদর্শন করে।[৩৪] *হে আমাদের কওমের লোকেরা, আল্লাহর প্রতি আহবানকারীর আহবানে সাড়া দাও এবং তার প্রতি ঈমান আনো। আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মাফ করবেন এবং কষ্টদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবেন।*[৩৫]

তাহলে এ দুটি স্থানের কোন একটিতে অবস্থান করতে পারে মানচিত্রে স্থান দুটির অবস্থান দেখুন ঃ
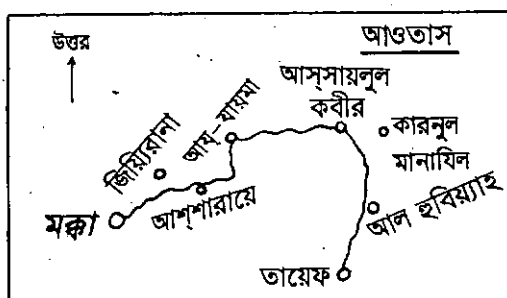
৩৪. এ থেকে জানা যায়, এসব জিন পূর্ব থেকে হযরত মূসা ও আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান রাখতো। কুরআন শোনার পর তারা বুঝতে পারলো পূর্ববর্তী নবী–রসূলগণ যে শিক্ষা দিয়ে আসছেন এটাও সেই শিক্ষা। তাই তারা এই কিতাব এবং এর বাহক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনলো।

৩৫. নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহ থেকে জানা যায়, এরপর জিনদের প্রতিনিধি দল একের পর এক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসতে থাকে এবং তাঁর সাথে তাদের সামনা সামনি সাক্ষাত হতে থাকে। এ বিষয়ে হাদীস গ্রন্থসমূহে যেসব বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে তা একত্রিত করলে জানা যায়, হিজরতের পূর্বে মক্কায় এ রকম প্রায় ছয়টি প্রতিনিধি দল এসেছিলো।

وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ
دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۳۲﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ
الْمَوْتٰى ؕ بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۳۳﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى
النَّارِ ؕ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿۳۴﴾

আর যে[৩৫] আল্লাহর পক্ষ থেকে আহবানকারীর আহবানে সাড়া দেবে না সে না পৃথিবীতে এমন শক্তি রাখে যে আল্লাহকে নিরূপায় ও অক্ষম করে ফেলতে পারে, না তার এমন কোন সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক আছে যে আল্লাহর হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে। এসব লোক সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে ডুবে আছে।

যে আল্লাহ এই পৃথিবী ও আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলো সৃষ্টি করতে যিনি পরিশ্রান্ত হননি তিনি অবশ্যই মৃতদের জীবিত করে তুলতে সক্ষম, এসব লোক কি তা বুঝে না? কেন পারবেন না, অবশ্যই তিনি সব কিছু করতে সক্ষম। যে দিন এসব কাফেরকে আগুনের সামনে হাজির করা হবে সেদিন তাদের জিজ্ঞেস করা হবে, "এটা কি বাস্তব ও সত্য নয়?" এরা বলবে "হাঁ, আমাদের রবের শপথ, (এটা প্রকৃতই সত্য)।" আল্লাহ বলবেন ঃ "ঠিক আছে, তাহলে তোমরা যে অস্বীকার করতে তার পরিণতি হিসেবে এখন আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো।"

এসব প্রতিনিধি দলের একটি সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ একদিন রসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা রাত মক্কায় অনুপস্থিত ছিলেন। আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম এই ভেবে যে, তাঁর ওপর হয়তো আক্রমণ হয়ে থাকবে। প্রত্যূষে আমরা তাঁকে হেরা পর্বতের দিক থেকে আসতে দেখলাম। জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন ঃ এক জিন আমাকে সংগে করে নিতে এসেছিলো। আমি তার সাথে গিয়ে জিনদের একটি দলকে কুরআন শুনিয়েছি (মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদেরই আরো একটি বর্ণনা হচ্ছে, মক্কায়, একবার নবী (সা) সাহাবাদের (রা) বললেন ঃ আজ রাতে তোমাদের মধ্য থেকে কে আমার সাথে

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ۚ بَلَاغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٥﴾

অতএব, হে নবী, দৃঢ়চেতা রসূলদের মত ধৈর্য ধারণ করো এবং তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না।[৩৭] এদেরকে এখন যে জিনিসের ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে যেদিন এরা তা দেখবে সেদিন এদের মনে হবে যেন পৃথিবীতে অল্প কিছুক্ষণের বেশী অবস্থান করেনি। কথা পৌছিয়ে দেয়া হয়েছে। অবাধ্য লোকেরা ছাড়া কি আর কেউ ধ্বংস হবে?

জিনদের সাথে সাক্ষাতের জন্য যাবে। আমি তাঁর সাথে যেতে প্রস্তুত হলাম। মক্কার উচ্চভূমি এলাকায় এক স্থানে দাগ কেটে নবী (সা) আমাকে বললেন ঃ এটা অতিক্রম করবে না। অতপর তিনি এগিয়ে গেলেন এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করলেন। আমি দেখলাম, বহু লোক তাঁকে ঘিরে আছে এবং তারা আমার ও নবীর (সা) মাঝে আড়াল করে আছে (ইবনে জারীর, বায়হাকী, দালায়েলুন নবুওয়াত, আবু নু'আইম ইসপাহানী)।

আরো একটি ক্ষেত্রেও রাতের বেলা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন এবং নবী (সা) মক্কার হাজুন নামক স্থানে জিনদের একটি মোকদ্দমার ফায়সালা করেছিলেন। এর বহু বছর পর ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফায় কৃষকদের একটি দলকে দেখে বলেছিলেন ঃ আমি হাজুনে জিনদের যে দলটিকে দেখেছিলাম তারা অনেকটা এই লোকগুলোর মত ছিল (ইবনে জারীর)।

৩৬. হতে পারে এই বাক্যাংশটি জিনদেরই উক্তির একটি অংশ। আবার এও হতে পারে যে, তাদের কথার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি যোগ করা হয়েছে। বক্তব্যের ধরন থেকে দ্বিতীয় মতটি অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

৩৭. অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তী নবী–রসূলগণ যেভাবে বছরের পর বছর ধরে ক্রমাগত ধৈর্য ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের জাতির অসন্তুষ্টি, বিরোধিতা, বাধা–বিপত্তি ও নানা রকম উৎপীড়নের মোকাবিলা করেছেন তুমিও সে রকম করো এবং কখনো মনে এরূপ ধারণাকে স্থান দিও না যে, হয় এসব লোক অনতিবিলম্বে ঈমান আনুক, নয়তো আল্লাহ তাদের ওপর আযাব নাযিল করুক।